Volume 11, Issue 1, 2024, 1-16

International Journal of Social, Political and Economic Research
ISSN: 2667-8810 (Online)
ijosper.uk

Original Article Received Date: 28-10-2023 Accepted Date: 01-02-2024

https://doi.org/10.46291/IJOSPERvol11iss1pp1-16

Re-reading of the Society and Culture in the Context of Administrative System in the 19th Century British Bengal: A Review

Obaidullah
Exploration Officer, Bangladesh National Museum, Shahbagh, Dhaka, Bangladesh;
oshuvoju@yahoo.com

Md. Masud Rana
Lecturer, Department of Statistics, Kumarkhali Government College, Kumarkhali, Kushtia;
ranatextile11@yahoo.com

Abstract

There have been revolutionary changes in the arts, literature and culture of Bengal during the post-Polasshey battle period. As the British interfered with the rule and government system, the then Muslims left no stone unturned to protect the so-called religious values cherished by Muslims. During this time the British brought about a lot of administrative reformation by passing and enacting newer laws in order to ensure their power long lasting. Although the British started ruling the Bengal with the purpose of trade and commerce at the beginning, later on they started ruling for political gains. They formulated laws that were suited to the existing society and culture and so the influence of newer forms of culture increased gradually. Although the local Muslims rejected the arts, education and culture of the British merchants, the Hindu community soon accepted them and became successful in attaining the satisfaction and favourism of the British. Thus, the Hindus solely succeeded in playing a great role in influencing the administration. After a further deterioration of the Muslims in the administrative role in the 19th century, the Muslim leaders realized the situation and they took some timely decisions. As a result, an introduction to Muslim renaissance started along with the changes of their previous negligence. By that time, the youths of the Hindu community, patronized by the British merchants and ruling community, have gained sole control in most of the social indexes including trade and commerce, education and job sectors. During this period, there arose a complicated proximity in the relationship between the Hindus and the Muslims and a result, a great change went through the socio-cultural aspects. The Muslims participated in some minor to significant rebellious movements against the British to get rid of the antagonistic/contradictory behavior, discrimination and exploitation of the British. These movements, although were not completely successful outwardly, paved the way for preparing a strong foundation of nationalistic movements later on. Thus, there arose a new context in which the study of language, arts, literature and gaining knowledge got a new dimension which paved the way for a new culture amidst the repudiation of the British elements.

Key words: *Society, Administration, Education, Culture, Renaissances.*

Volume 11, Issue 1, 2024, 1-16

ঊনিশ শতকে বৃটিশ বাংলায় প্রশাসন ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজ ও সংস্কৃতির পুনর্পাঠঃ একটি পর্যালোচনা

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পলাশী যুদ্ধে বাংলার মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক পতনের পর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তনগুলি প্রায় দীর্ঘ সময়ব্যাপী সামাজিক সূচকের প্রায় প্রতিটি বিভাগে যোজন-বিয়োজনের মাধ্যমে ঘটে। ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির ভিন্নতা এবং শাসন ক্ষমতার প্রতিযোগিতার কারণে মুসলমানদের সাথে ইংরেজদের এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ বিরাজমান থাকতো। ফলে তাদের সাথে শাসক গোষ্ঠির ব্যাপক দূরত্ব তৈরি হয়। ইংরেজ বেণিয়াদের সাথে যুদ্ধ করে মুসলমানরা ধর্মীয় মূল্যবোধ সমুন্নত রেখে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির প্রাণান্তকর ব্যার্থ চেষ্টা করে। এমনি পর্যায়ে ক্রমান্বয়ে মুসলমানরা আরো প্রান্তিক পর্যায়ে পৌছে যায়। সামাজিক প্রায় সকল সূচকে মুসলমানরা পিছিয়ে যায়। এরূপ অবস্থার প্রেক্ষিতে উনিশ শতকের প্ররম্ভে মুসলমান সমাজের পুনর্জাগরণ পরিলক্ষিত হয়। এ পুনর্জাগরণে অনেক মুসলিম মণিষী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অধিক্ষেত্রগুলো নিয়ন্ত্রনের জন্যে ইংরেজ বেণিয়ারা প্রশাসনিক সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করে। ইংরেজ বেণিয়ারা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এদেশে ক্ষমতা দখলের পর সমকালীন প্রশাসনিক কাঠামো ব্যপকভাবে সংস্কার করে।

বিদ্যমান গবেষণায় ইংরেজ বেণীয়াদের দ্বারা সমকালীন বাংলার প্রশাসনিক সংস্কারের ফলে রাজনৈতিক, আর্থ সামাজিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতির রুপান্তর কিভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং এর চুড়ান্ত পরিণতি কিরুপ হয়েছে তা একটি বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার সূত্রপাত করাই আলোচ্য প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

বর্তমান গবেষণাটি সম্পাদনের জন্য এ বিষয়ের উপর বিভিন্ন উৎস হতে তথ্য, উপাত্ত ও উপকরণ সংগ্রহ করে গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিনির্ভর পুনর্গঠন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্য মাঠ কর্ম সম্পাদন করা হয়েছে। তবে এরুপ গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে নানারুপ সীমাবদ্ধতা থাকা অস্বাভাবিক নয়। তথাপিও গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের জন্য নানাবিধ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক বাংলার প্রশাসন ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি বোঝার সুবিধার্থে সুলতানী ও মুঘল আমলের সমাজ-সংস্কৃতি ও প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়।

সুলতানি ও মুঘল আমলের সমাজ-সংস্কৃতি ও প্রশাসন ব্যবস্থা

১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি বাংলায় মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন। তিনি বাংলা বিজয়ের পর লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপন করেন এবং শাসন কাজের সুবিধার্থে রাজ্যকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেন। এ সময় রাজ্যের প্রধানকে `মুকতা, বলা হতো। ইখতিয়ার খলজির বাংলায় মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলা ৫(পাঁচ)টি ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক এলাকায় বিভক্ত ছিল (Blochman, 1968, p.3) । এ ভৌগোলিক বা প্রশাসনিক এলাকাগুলো হলো-(১) বরেন্দ্র বা বারিন্দ (২) রাঢ় (৩) মিথিলা (৪) রাঢ় বা রাঢ়ী (৫) বঙ্গ। এ সকল ভৌগোলিক বা প্রশাসনিক এলাকা প্রাকৃতিক সীমানা বা নদীপথের গতিবিধি দ্বারা নির্ধারিত ছিল (আলী, ২০০৮, পৃ. ২২২)। যদিও বখতিয়ার খলজি সমগ্র বাংলা অধিগ্রহণ করে যেতে পারেন নি। তবে ধীরে ধীরে সমগ্র বাংলা অঞ্চল মুসলিম শাসনের অধীনে আসলেও এটি দীর্ঘকালব্যাপী দিল্লীর অধিনস্ত একটি প্রদেশ হিসেবে শাসিত হয়। কিন্তু তৎকালীন বাংলার শাসকরা দিল্লীর অধিনস্ত হলেও বাংলার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে প্রায় স্বাধীনভাবে শাসন কার্য্য পরিচালনা করতেন।

তুর্কি মুসলমানরা বাংলা বিজয়ের পর বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়। এ সময় পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার সাথে বাংলার সাংস্কৃতিক যোগাযোগের বিনিময় ঘটে। তুর্কিদের দ্বারা মধ্য এশিয়া হতে উন্নত শিক্ষা ও সংস্কৃতি বাংলায় বিকাশিত হয় (Dani, 1961, P. 2)। বিজিত মুসলমানরা বাংলা জয় করার পর এদেশের সম্পদ লুট করে তাঁদের দেশে নিয়ে যায় নি। বরং বিজীত মুসলমানরা এদেশের মানুষের জীবনমান উন্নত করার জন্য এদেশের বিভিন্ন স্থানে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন (Raverty, 1970, P. 427)।

ইতিহাসের বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে, শামস-আল-দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৮) দিল্লীর সাথে নামমাত্র সম্পর্ক বজায় রেখে বাংলায় প্রথম স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করে (রহিম, ১৯৯৪, পৃ.৯)। তিনি বাংলার সকল জনপদকে একত্রিত করে `বাঙ্গালা, নামকরণ করেন (Dani, 1958, p.58)। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান দাউদ কররানী মুঘল শাসকের নিকট পরাজিত ও নিহত হন। সুলতান দাউদ কররানী নিহত হওয়ার পর প্রায় সমগ্র বাংলায় স্থানীয় জমিদাররা প্রবল শক্তিশালী হয়ে উঠে। ইতিহাসে এরা `বার ভূইয়া, নামে পরিচিত।

মুঘল শাসকদের নিকট স্থানীয় জমিদাররা বশ্যতা স্বীকার করে। ফলে মুঘল শাসকরা প্রায় ২০০ বছর এদেশ শাসন করে। মুঘল সম্রাট আকবর শাসন কার্যের সুবিধার জন্য তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যকে সুবা, সরকার ও পরগণায় বিভক্ত করেন। রাজকার্য সহজ ও সুষ্ঠভাবে পরিচালনা এবং বেশি পরিমাণ রাজস্ব আদায়ের সুবিধা নিতেই এ ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের (১৬৫৮-১৭০৭) মৃত্যুর পর তারঁ উত্তরাধিকারীদের অদক্ষতা ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের কারণে মুঘল সাম্রাজ্য ক্রমে দুর্বল রাজ্যে পরিণত হয়। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে নবাব মূর্শিদকুলি খাঁন বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন। তিনি ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে সুবে বাংলাকে ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করেন। চাকলার প্রধানরা চাকলাদার নামে পরিচিতি লাভ করে। এ সুযোগে সুবেদার মুর্শিদকুলী খাঁন (১৭১৭-১৭২৭ খ্রিস্টাব্দ) বাংলায় স্বাধীন রাজ্য পুন:প্রতিষ্ঠিত করেন।

বাংলায় মুসলিম শাসকদের রাজনৈতিক বিজয়ের পর এদেশে বিভিন্ন এলাকায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সকল মাদ্রাসায় আরবি, ফারসি ও বাংলা শিক্ষার প্রচলনের মাধ্যমে হাদিস, ফিকাহ শাস্ত্র, তাফসির প্রভৃতি পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়। বাংলা ভাষায় লিখিত বই পুস্তক না থাকায় এ অঞ্চলে আরবি ও ফারসি ভাষা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। যোগশাস্ত্র সংক্রান্ত সংস্কৃত ভাষায় রচিত `অমৃতকুণ্ড, গ্রন্থটি আরবি ও ফারসি ভাষায় অনুদীত হয়। বাংলাদেশে ফারসি ভাষায় রচিত নাম-ই-হক, ফরহঙ্গ-ই-ইবরাহীমী, ফরহঙ্গ-ই-আমীর শাহাব-উদ-দীন, ওয়াহেদী হাবল মতীন, সহীহ বোখারী, হেদায়ত-উর-রামী, গঞ্জ-ই-রাজ, মৃগাবতীসহ অসংখ্য গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যে চর□যাপদের রচনাকাল থেকে প্রায় দুইশত বছর পর মুসলিম শাসনামলে চণ্ডীদাসের `শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, রচিত হয়। মুসলমান শাসনের পূর্বে হিন্দু ও তৎপূর্বে বৌদ্ধিক শাসনের প্রচলন ছিল। সেন শাসকরা দেব দেবীর গুনকীর্তনের জন্য সংস্কৃত ভাষার চর্চা করতো। ব্রাহ্মণ ছাড়া সংস্কৃত ভাষা চর্চা করা ছিল শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সেন রাজদরবারের ভাষা সংস্কৃত হওয়ায় ব্রাহ্মণরা অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়। অন্য ভাষায় দেব-দেবীদের গুণকীর্তনের জন্য সাধারণ জনগনের কোন অধিকার ছিল না। সাধরণ জনগনের ভাষা ছিল বাংলা। ইলিয়াস শাহী রাজবংশে অনেক উচ্চপদস্থ হিন্দু রাজকর্মচারীর নাম পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে রাজা গণেশ অন্যতম। সুলতানি আমলে কৃত্তিবাস, মালাধর বসু, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শীকর নন্দী, দ্বিজ শ্রীধর চণ্ডীদাস, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিঁপলাই, শাহ মোহাম্মদ সগীর প্রভৃতি কবি-সাহিত্যিকরা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। মুঘল আমলেও উল্লেখ্যযোগ্য শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটে। এ সময় শিক্ষা ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটে। গ্রামে-গঞ্জে, শহর বন্দরে রাষ্ট্রিয় প্রচেষ্টার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সহযোগীতায় অসংখ্য মাদ্রাসা, মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সকল মাদ্রাসা-মক্তবে জনসাধারণ শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। সাধারণ জনগণের মাঝে অধিকতর সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশের পাশাপাশি নগরায়নের উদ্ভব হয়। গৌড়, দেবকোট, সোনারগাঁও, পান্ডুয়া, টান্ডা, রাজমহল, জাহাঙ্গীরনগর ও মুর্শিদাবাদে মুসলিম শাসনামলের অন্যতম নগর সংস্কৃতির আবির্ভাব হয় (আক্তারুজ্জামান, ২০০৭, পৃ.৫৪১)। মূলত ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন পলাশি যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে প্রায় দু,শ বছরের জন্য বাংলা ইংরেজ বেণিয়াদের দখলে চলে যায়।

বৃটিশ বাংলার প্রশাসনিক সংস্কার ও এর প্রভাবঃ

পলাশি যুদ্ধে নবাবের পতনের পর বাংলার মানুষের জীবনমান ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ বেণিয়াদের সাথে বক্সারের যুদ্ধে মীর কাশেম পরাজিত হয় এবং ইংরেজরা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাথে মুঘল সম্রাটের সাথে এলাহাবাদ চুক্তির মাধ্যমে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা,বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে। এলাহাবাদ চুক্তির মাধ্যমে মূলত বাংলায় মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারতবর্ষে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন শুরু হয় (Smith, 1970, P.466)। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মকর্তাদের অতিরিক্ত অর্থলোলুপতার কারণে বাংলায় মাত্র কয়েক বছর পরে অর্থাৎ ১৭৬৯-১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়। এ দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষ খাদ্যাভাবে নিহত হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলার দেওয়ানী লাভ করার ফলে রাজস্ব আদায়ের জন্য `আমিল অফিসার, নিয়োগ করে। কিছুদিন পর `আমিল অফিসার, পদ বিলুপ্ত করে `সুপারভাইজার, নিয়োগ করে। নব নিয়োগপ্রাপ্ত `সুপারভাইজার,রা ছিলেন বৃটিশ নাগরিক ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিজস্ব কর্মচারী। জমিদারিতে `সুপারভাইজার, নিয়োগ করেও ইংরেজরা কোম্পানীর প্রত্যাশিত রাজস্ব সংগ্রহ করতে ব্যার্থ হয়। ফলে এ পদটি বিলুপ্ত করে কালেক্টর নামে নতুন পদের সৃষ্টি করে।

কালেক্টররা রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি বিচার বিভাগীয় সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। ফলে জমিদারদের উপর আরো নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্টা করা সহজ হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তৎকালীন বৃটিশ বাংলায় কোম্পানীর কর্মকর্তাদের সীমাহীন দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা, অসম ভূমি ব্যবস্থাপনা, লুটপাট ও অর্থনৈতিক শোষণের জন্য ভয়াবহ দুর্যোগ দেখা দেয়। উপরন্তু এ বছর সমগ্র বাংলায় কোম্পানীর অতিরিক্ত খাজনা আদায় ও অনাবৃষ্টির কারণে ফসল নষ্ট হওয়ায় বাংলার মানুষ ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। এ সময় বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ইতিহাসে এটি সত্তরের মন্বত্তর নামে পরিচিত। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষকে ঐতিহাসিকরা "সত্তরের মন্বন্তর„ নামে আখ্যায়িত করেছে {Khan (ed.), 1978, P. 24-27}। এ দুর্ভিক্ষে প্রায় ১কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ নিহত হয়। এ সময়ের পর চতুর ইংরেজরা বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সন্তুষ্ট করার জন্য এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা, মাদরাসা প্রতিষ্ঠা, হিন্দু আইনের উপর প্রবন্ধ লেখা, আইন-ই-আকবরীর ইংরেজী তরজমা করেন (দেবী, ১৩৬১ ব., পৃ.১৪)।

এরূপ অবস্থার প্রেক্ষিতে বাংলার মানুষকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের যৌক্তিকতা ব্যাখা দিয়ে দৈত্ব শাসন ব্যবস্থার বিলোপ করে। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলা বিহারের গভর্ণর ও পরবর্তীতে ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হয় (Ali, 1978, P. 3)। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস এর শাসনামলে নাথানিয়াল ব্রাসি হ্যালহেড (Nathaniel Brassey Halhed) ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশ করেন (Halhed, 1980, P.8)। নাথানিয়াল ব্রাসি হ্যালহেড (Nathaniel Brassey Halhed) এর দু,বছর পরেই ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে চার্লস উইলকিনস (Charles Wilkins) "Bengal Grammar„ প্রকাশ করেন। এভাবে নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে ইংরেজরা এদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা বোঝার চেষ্টা করে। বস্তুতপক্ষে জমিদারিতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, রাজস্ব আদায় ও বিচারিক ক্ষমতা প্রদান করে সুপারভাইজার পদটি বিলুপ্ত করে কালেক্টর নামক নতুন কর্মকর্তা নিয়োগ করে কোম্পানী সরকার। ওয়ারেন হেস্টিংস সমগ্র দেশকে ১৯টি জেলায় বিভক্ত করে `কালেক্টর, নামক একজন জেলা প্রশাসক নিযুক্ত করেন।

জেলাগুলোর নাম যথাক্রমে হুগলী, মোহাম্মদশাহী, নদীয়া, দিনাজপুর, রংপুর, বীরভূম, যশোর, ঢাকা, রাজশাহী, লস্করপুর, রোকনপুর, ত্রিপুরা, কলিন্দা (নোয়াখালী), জাহাঙ্গীরনগর, চুনাখালী, চট্রগ্রাম, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও কোলকাতা (Bahadur, 1918, P.23)। জেলাগুলোকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। প্রদেশগুলো হলো যথাক্রমে-কোলকাতা, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর ও ঢাকা। প্রত্যেক প্রদেশের জন্য

০৪(চার) সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রাদেশিক কাউন্সিল গঠন করা হয়। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রশাসনিক কাঠামো পূণর্বিন্যাস করে জেলা সংখ্যা বৃদ্ধি করে ২৮টিতে উন্নিত করা হয় (Bahadur, 1918, p.11)। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাশ হয়। এ রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুসারে কোলকাতায় একটি সুপ্রিম কোর্ট স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে এর অনুকরণে মাদ্রাজে ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে , বোম্বাইতে ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে সুপ্রিম কোর্ট স্থাপন করা হয় (রায় ও অন্যান্য, ২০১৩, পৃ.৮৫১)। রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য প্রতিটি জেলায় একজন করে `দিওয়ান বা দেওয়ান, নিয়োগ দেয়া হয়। দেওয়ানরা স্থানীয় রাজস্ব সংগ্রহ ও রাজস্ব সংক্রান্ত স্বল্প পরিসরে বিচারিক কার্যাদি সম্পন্ন করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিল। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে ২৮টি দেওয়ান শাসিত জেলাকে পূণর্বিন্যাস করে ১৪টি জেলায় রুপান্তর করা হয় এবং জেলা দেওয়ান প্রথা বিলুপ্ত করে প্রতি জেলায় একজন করে ইউরোপীয় কালেক্টর নিযুক্ত করা হয় (ইসলাম, ১৯৮৪, পৃ.২২৮)।

১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে গঠিত ১৪টি জেলা যথাক্রমে বীরভূম, মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম, মুর্শিদাবাদ, চব্বিশ পরগণা, যশোর, ঢাকা, রাজশাহী, দিনাজপুর, ভুলুয়া, ময়মনসিংহ, রংপুর, বর্ধমান ও নদীয়া (Bahadur, 1918, P.14)। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলা থেকে পরগণা, বলদাখান ও গঙ্গামণ্ডল (বর্তমান ব্রাহ্মণবাড়ীয়া); চট্রগ্রাম থেকে ভুলুয়া (বর্তমান নোয়াখালী) এবং ঢাকা থেকে দাউদকান্দী এবং ত্রিপুরাকে নিয়ে ত্রিপুরা নামে নতুন জেলা সৃষ্টি করা হয়। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে মোট জেলা সংখ্যা ছিল ১৫টি (ইসলাম, ১৯৮৪, পৃ.২৮)। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তো প্রবর্তিত হয়। ফলে সমাজে নানারুপ পরিবর্তন সূচিত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ইংরেজ আনুকূল্যে থাকা নতুন নতুন স্থানীয় জমিদার শ্রেণি তৈরি হয়। কোম্পানী সরকারের এ ধরনের সিদ্ধান্তের কারণে পুরাতন অনেক জমিদার নি:স্ব হয়ে যায়। সমাজে এক ধরনের বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। এ সময় নব্য সৃষ্ট জেলাগুলো অনেক বড় ছিল। ফলে প্রশাসনিক কার্যক্রমে জটিলতা তৈরি হয়। এতে সাধারণ জনগণ ব্যাপক অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হয়। জেলা শহরে আসতে হলে কয়েকদিন হেটে বা অনেক দূর পথ পাড়ি দিয়ে আসতে হতো। সে কারণে সাধারণ মানুষজন দারুণভাবে অবহেলিত ছিল। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের কোম্পানীর শাসনামলে পর্যায়ক্রমে নিম্নোক্ত জেলাগুলো গঠিত হয়।

সারণি-০১

বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামলে বাংলার জেলা বিভাজন, ১৭৯৫-১৮৬৫।

নতুন জেলার নাম	খ্রিস্টাব্দ	মূল জেলার নাম
হুগলী	১৭৯৫	বর্ধমান
মালদহ	১৮১৫	পূর্ণিয়া
ফরিদপুর	১৮১৫	ঢাকা
বাকেরগঞ্জ	১৮১৭	ঢাকা
দার্জিলিং	১৮১৭	সিকিম রাজ্য থেকে পাওয়া
বগুড়া	১৮২১	রাজশাহী
নোয়াখালী	১৮২২	ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম
বাঁকুড়া	১৮৩৭	বর্ধমান
সাঁওতাল পরগণা	১৮৫৬	বীরভূম

Source: chakrabarti (1918), *Summary of changes in the Jurisdiction of Districts in Bengal, (1757-1916)*, Calcutta: Bengal secretariat press.

১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে মূলত প্রশাসনিক কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। এ সময়ই জেলা প্রথার সৃষ্টি হয়। ফলে লর্ড কর্ণওয়ালিস ফৌজদারি বিচার, পুলিশের উপর নিয়ন্ত্রণ, রাজস্ব আদায় প্রভৃতি কাজ জেলা কালেক্টরের উপর দায়িত্ব অর্পণ করে জেলা প্রশাসনকে শক্তিশালী করেন। ফলশ্রুতিতে কালেক্টরদের স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব, স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি প্রভৃতি কারণে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস বিচার বিভাগকে পৃথক করে প্রতি জেলায় একজন করে জজ নিয়োগ করেন। বেতন ও পদ মর্যাদার দিক দিয়ে কালেক্টরের উপরে রাখেন জেলা জজকে। কালেক্টরের মাসিক বেতন ছিল প্রায় ২,০০০টাকা এবং জেলা জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটের মাসিক বেতন ছিল প্রায় ৩,০০০টাকা (*cornwallis,*1793, p.9)।

প্রসঙ্গের ধারবাহিকতা রক্ষার্থে উল্লেখ্য যে, ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দ ইস্ট ইন্ডয়া কোম্পানীর সাথে দিল্লী রাজপরিবারের পতন হয় (sherwani, 1981, P.160)। ফলশ্রুতিতে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সমগ্র ভারতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। এমতাবস্থায়, বাংলাসহ ভারতে বৃটিশ ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য কোম্পানীর বোর্ড অব ডাইরেক্টর ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে আবারো প্রশাসনিক কাঠামো সংস্কার করে গভর্ণর জেনারেলকে আরো ক্ষমতা দেয়। ভৌগোলিক কারণে যে সব এলাকা নিজ জেলা সদরের চেয়ে পাশ্ববর্তী জেলা সদরের নিকটবর্তী সেসব অঞ্চলের জন্য অধিকতর নিকটবর্তী জেলার ম্যাজিস্ট্রেটকে উক্ত অঞ্চলের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দেন গভর্ণর জেনারেল। এ আইনের ফলে জেলা প্রশাসন ও আন্ত:জেলা প্রশাসনের মধ্যে ক্ষেত্র বিশেষে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং জটিলতা তৈরি হয়। লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসেবে নিয়োগ লাভ করে। এসময় বাংলায় শিল্প-সাহিত্যের বিকাশ শুরু হয়। এ সময় মুসলিম যুবকদের মধ্যেও শিল্প-সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট পরিলক্ষিত হয় এবং নবজাগরণের সৃষ্টি হয়। ওয়ারেন হেস্টিংস এবং তাঁর স্ত্রীর স্বদেশী শিল্প-সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী ছিল। তিনি প্রাক্তন ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সির গভর্নর ছিলেন। ওয়ারেন হিস্টিংস এর স্ত্রীর নাম ছিল ফ্লোরা হেস্টিংস (Losty, 1996, P.189) । হেস্টিংস এবং তার স্ত্রী লেডি ফ্লোরা স্বদেশী শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তৎকালীন বৃটিশ দু,জন শিল্পি জজ চিনারি (George chinnery) এবং চার্লস ডি ওইলি (Charles D,oyly) খ্যতি অর্জন করেন। সমকালীন বৃটিশ ভারতের দু,একজন হিন্দু চিত্রকরের নাম পাওয়া গেলেও কোন মুসলিম শিল্পীর নাম পাওয়া যায় নি। বিশ শতকের শেষ দশকে হেস্টিংস এর কন্যা লেডি সোফিয়া বৃটিশ লাইব্রেরির ইণ্ডিয়া গ্যালারিতে প্রাপ্ত বিভিন্ন দেশের শিল্পীদের চিত্রাঙ্কনের ২৫টি অ্যালবাম প্রকাশ করেন। ২৫টি অ্যালবামের মধ্যে ভারতের প্রখ্যাত চিত্রকর সীতারামের অ্যালবাম রয়েছে। কিন্তু এ সময় কোন মুসলিম চিত্রকরের নাম জানা যায় না।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের পর প্রশাসনিক মূল কাঠামোতে খুব একটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিসের উত্তরসূরী লর্ড বেন্টিংক ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে প্রাদেশিক কোর্ট অব সার্কিট এবং প্রাদেশিক সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ পদটি বিলুপ্ত করেন। জেলা প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় সরকারের মাঝামাঝি `কমিশনার অব রেভিনিউ এন্ড সার্কিট, নামে নতুন একটি পদ সৃষ্টি করা হয়। প্রত্যেক কমিশনারকে একটি ডিভিশনের প্রধান করা হয়। কয়েকটি জেলা নিয়ে গঠিত হয় একটি ডিভিশন। এই নতুন আইনের ফলে জেলা জজ এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে সরাসরি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে হয়। সুতরাং বোর্ড অব রেভিনিউর অধীন ডিভিশনাল কমিশনার এবং ডিভিশনাল কমিশনারের অধীন হন জেলা কালক্টর। যা অদ্যাবধি এই কাঠামো বিদ্যমান। এখানে কমিশনাররা মূল ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন।

এ আইনে কমিশনাররা তাদের অধীনে জেলায় জেলায় ঘুরে ফৌজদারি বিচার করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। কিন্তু ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে কমিশনারের ফৌজদারি ক্ষমতা জেলা জজের কাছে হস্থান্তর করা হয় আর জেলা জজের ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা জেলা কালেক্টরের কাছে হস্তান্তর করা হয় (*Regulation act, 1831, 111 of 1835)*। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে কালেক্টর থেকে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা পৃথক করে প্রতি জেলায় পৃথক ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দেয়া হয়। ফৌজদারি বিচারিক ক্ষমতা জেলা জজের উপর ন্যস্ত হওয়ায় জেলা জজের ব্যাস্ততা বৃদ্ধি পায়। জেলা জজের উপর চাপ কমানোর জন্য ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে লর্ড বেন্টিংক ৫,০০০ টাকার মামলা গ্রহণের ক্ষমতা দিয়ে `প্রিন্সিপাল সদর আমিন, নামে প্রত্যেক জেলায় ১টি করে পদ সৃষ্টি করেন। এরপর ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতি জেলায় ১জন করে অতিরিক্ত জেলা জজ নিযুক্ত করেন। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে

প্রিন্সিপাল সদর আমীনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে আদেশ জারি করেন। উক্ত নির্দেশে তাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ৫,০০০ টাকার অধিক যে কোন অঙ্কের টাকার বিচারিক ক্ষমতা প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়। কালেক্টরকে সাহায্য করার জন্যে ডেপুটি কালেক্টরের পদ সৃষ্টি করা হয়। এ সময় কালেক্টর থেকে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা আলাদা করে প্রতি জেলায় একজন পৃথক ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা হয়। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রত্যেক জেলায় এক বা একাধিক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয় (Field, 2020), P.216)। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেটের পদ একীভূত করা হয় এবং বেতন কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট করা হয়। উল্লেখ্য ডেপুটি কালেক্টর ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ স্থানীয়দের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। লর্ড বেন্টিংক বড় বড় কিছু জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে Sub-divitional officer নামে কিছু সংখ্যক ম্যাজিস্টেট নিয়োগ দেন। উপরোক্ত প্রশাসনিক কাঠামো লক্ষ করলে দেখা যায় বৃটিশ ভারতের সামাজিক ব্যবস্থাপনায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তো গভীর প্রভাব ফেলে। বাংলাকে শাসন ও শোষণ করার জন্য বৃটিশ সরকার এক জটিল প্রশাসন পদ্ধতির প্রচলন করে। প্রশাসনিক কাঠামো সংস্কারে লর্ড কর্ণওয়ালিস ও লর্ড বেন্টিংক নানা ধরনের প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

এদেশে জমিদারদের উপর নিয়ন্ত্রণ, পুরাতন জমিদারী বিনষ্ট করা, নতুন জমিদারি সৃষ্টি, রাজস্ব আদায়, প্রজাদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়ের উপর ট্রায়াল দিতে থাকে। সুচতুর ইংরেজরা এসব ট্রায়ালের মধ্য দিয়ে কখনো কালেক্টর সৃষ্টি আবার কখনো ম্যাজিস্ট্রেটের পদ সৃষ্টি আবার কখনো জজের পদ সৃষ্টি করে এদেশের জন্য প্রযোজ্য কার্যকর ও নিয়ন্ত্রণমূলক এক জটিল প্রশাসনিক কাঠামো প্রবর্তন করে। তাদের কার্যের সুবিধার্থে তাদের নিজস্ব বলয়ের কিছু স্থানীয় উচ্ছিষ্টভোগী তৈরি করতে সক্ষম হয়। তাদের জন্য উচ্চ পর্যায়ের কোন পদ সংরক্ষিত ছিল না। কিন্তু নিম্ন পর্যায়ের কিছু পদ তাদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। আর এরাই ইংরেজ শাসনের প্রশংশা করে এবং ইংরেজ সরকারকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করে। উদাহরণ স্বরুপ বিচার বিভাগে স্থানীয় কমিশনার বা মুনসেফের পদটি স্থানীয়দের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। অর্থাৎ এদেশীয়রাই মুনসেফ হতে পারতো। তার ক্ষমতা ছিল সর্বোচ্চ ৫০টাকা মূল্যের মামলা গ্রহণ করা। তার নিজের কোন বেতন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ছিল না। মুনসেফ বিচার প্রার্থীর কাছ থেকে মামলার মূল্যের উপর প্রতি এক আনা ফি গ্রহণ করেতে পারত। এ ফি থেকে নিজের ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন পরিশোধ করতে হতো। ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে বোর্ড অব ডাইরেক্টরের নির্দেশানুযায়ী লর্ড বেন্টিংক বিচার বিভাগে প্রিন্সিপাল সদর আমিন এবং রাজস্ব বিভাগে ডেপুটি কালেক্টর পদ সৃষ্টি করে স্থানীয়দের জন্য। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইংরেজদের ভাষাগত ভিন্নতার কারণে বিচারপ্রার্থীদের সমস্যাগুলো বুঝতে পারত না। ফলে এদেশীয়দের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। প্রশাসনিক কাঠামোকে কার্যকরভাবে রুপরেখা প্রদানের জন্যে এবং সাধারণ মানুষের কথা বোঝার জন্যে অপেক্ষাকৃত তাদের অনুগতদের এসব পদে নিয়োগ প্রদান করতো।

এ নিয়োগের মাধ্যমে তারা স্থানীয়দের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেছিল। অপরপক্ষে, ভাষাগত ভিন্নতার কারণে প্রশাসন ও বিচার বিভাগে যে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয় সেটি দূরীভূত করা সম্ভব হয়। কিন্তু উচ্চ পদগুলোতে অর্থাৎ নীতি নির্ধারণী কোন পদে স্থানীয়দের দিতো না। প্রশাসনিক কাঠামো স্থিতিশীল হলে কোম্পানী শাসন সুদৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। বাংলাসহ সমগ্র ভারতে ইংরেজ বেনীয়ারা শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধার জন্য নানা ধরণের সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেন। এ প্রেক্ষিতে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রশাসনিক ও বিচার ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করার জন্য দীর্ঘ দিন ধরে তারা এদেশের সমাজ, সংস্কৃতির সাথে পরিপূর্ণভাবে মিশে গেছেন। তৈরি করেছেন বিখ্যাত পেনাল কোড বা দণ্ডবিধি। যা বিচারিক আদালতে বাইবেল হিসেবে আজো অক্ষুন্ন আছে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে,দীর্ঘদিন ধরে ভারতে বিচারকার্য্য পরিচালনার জন্য কতকগুলি বিধি (Regulation Act) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের আইনে (Charter Act) গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলে একজন আইন-সদস্য নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। লর্ড মেকলে আইন-সদস্য (Law member) নিযুক্ত হয়েছিলেন। বেন্টিংক মেকলের সভাপতিত্বে একটি আইন কমিশন নিয়োগ করেন।

মেকলের প্রচেষ্টায় বিখ্যাত ভারতীয় পেনাল কোড (penal code) বা দণ্ডবিধি রচিত হয় (রায় ও অন্যান্য, ২০১৩, পৃ.৮৫০)। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে বিখ্যাত পেনাল কোড আজোবধি ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের আদালতে আদর্শ আইন হিসেবে বিবেচিত হয়। এ আইনের বিষয়টি ভারতে দীর্ঘমেয়াদী বৃটিশ শাসনের পথ সুগম করেছিল।

ভারতীয় আইন বিশেষজ্ঞরা বর্ণিত আইনটি পরিবর্তনের বহু চেষ্টা করলেও একটি শব্দও পরিবর্তন করতে সামর্থ হন নি। সুতারাং এ কথা অনস্বীকার্য যে, বৃটিশদের উন্নত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের কারণে ভারতীয় উপমহাদেশে তাদের দীর্ঘ শাসনের পথ অবধারিত হয়েছিল। উনিশ শতকের প্রারম্ভে কোম্পানী সরকার শ্রেণি বৈষম্য সৃষ্টি করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সরকারের অনুগত শিক্ষিত শ্রেণি তৈরির চেষ্টা করেন। এ সময় বাংলা ভাষা চর্চার উৎকর্ষতা লাভ করে। এ শিক্ষিত শ্রেণি কোম্পানীর পক্ষে দোভাষী হিসেবে কাজ করেন। কিন্তু এ শ্রেণিতে একচেটিয়া উচু শ্রেণির হিন্দু যুবকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে হিন্দু যুবকরা প্রায় একচেটিয়া ইংরেজদের আনুকূল্য লাভ করে। মুসলিম যুবকরা আধুনিক শিক্ষা দিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। বৃটিশ বাংলায় খ্রিস্টান মিশনারীরা সহশিক্ষাসহ আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চেষ্টা করে। সহশিক্ষা খুব বেশী কার্যকর না হওয়ায় বৃটিশরা বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তদরুপ কলকাতার গৌরিবাড়ীতে খ্রিস্টান মিশনারীরা " ফিমেল জুভেনাইন সোসাইটি,, নামে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় প্রায় ৫০টির অধিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তথ্য পাওয়া যায় (Adam & babu, 1941, P.48)। ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত এসব স্কুলগুলোতে প্রায় একচেটিয়া হিন্দুরা পড়াশোনা করতো। স্কুলগুলোতে অধিকাংশ শিক্ষক ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বী। ফলে খুব সহজেই হিন্দু ছাত্ররা স্কুলগুলোতে সুবিধা পেত এবং হিন্দু যুবকদের মধ্যে স্কুলে ভর্তির বিষয়ে অধিক পরিমান আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। অপরপক্ষে মুসলিম ছাত্ররা ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে স্কুলগুলোতে ভর্তি হতে স্বাচ্ছন্নবোধ করতো না। মুসলিম ছাত্ররা সংখ্যায় কম থাকায় নানা ধরণের বঞ্চনার শিকার হতো। স্কুলগুলোতে অধিকাংশ শিক্ষক হিন্দু হওয়ায় মুসলিম ছাত্ররা নানান ক্ষেত্রে বঞ্চনার শিকার হতো। ফলে মুসলিম ছাত্ররা স্কুলে যেতে অনাগ্রহী হয়ে পড়তো। কিন্তু সময়ের বিচারে ক্রমান্বয়ে পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে দেখা যায়। উদাহরণ হিসেবে আমরা উনিশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিন্দু-মুসলিম শিক্ষার্থীর সংখ্যা পর্যালোচনা করতে পারি (মওদুদ, ১৯৮২, পৃ. ৩০৪)।

সারণি-০২

১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় ইংরেজি স্কুল ও মাদরাসাসমূহে হিন্দু-মুসলিম ছাত্র সংখ্যার পরিসংখ্যান।

ক্র.নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	মুসলিম ছাত্র	হিন্দু ছাত্র
১	কলিকাতা মাদরাসা	১৫২ জন	শূণ্য
২	হুগলী মাদরাসা	২৮০ জন	শূণ্য
৩	ঢাকা কলেজ	২৪ জন	৩০১ জন
৪	কুমিল্লা স্কুল	১৮ জন	১১৯ জন
৫	চট্টগ্রাম স্কুল	১৪ জন	৭২ জন
৬	সিলেট স্কুল	৩ জন	৪৫ জন
৭	যশোর স্কুল	৩ জন	৯৬ জন

কোলকাতা ও হুগলী মাদরাসাতে শুধুমাত্র মুসলিম ছাত্ররা পড়াশোনা করতে পারতো। কিন্তু অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে একচেটিয়া হিন্দু ছাত্রদের প্রাধান্য ছিল। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলার ঢাকা কলেজ, কুমিল্লা স্কুল, চট্টগ্রাম স্কুল, সিলেট স্কুল ও যশোর স্কুলে মুসলিম ছাত্রসংখ্যা মাত্র ৮% এবং হিন্দু ছাত্রসংখ্যা ৯২%। সুতরাং পরিসংখ্যানের হিসাব মতে ঢাকা জেলায় মুসলিম জনগোষ্ঠী ৫৯.১ শতাংশ এবং হিন্দু জনগোষ্ঠী ৪০.৪ শতাংশ পাওয়া যায়।

ঢাকা কলেজে ঐ সময়ের প্রায় কাছাকাছি সময়ে মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩২৫জন। তন্মধ্যে হিন্দু ছাত্র ছিল ৯২.৬১৫ শতাংশ অপরপক্ষে মুসলিম ছাত্র ছিল মাত্র ৮.৬১৫ শতাংশ। মুসলিম সমাজের এরকম রুগ্ন অবস্থা দেশের প্রায় সকল পর্যায়ে দেখা যায়। চট্রগ্রাম জেলায় হিন্দু জনগোষ্ঠী ছিল মাত্র ২৪.৩ শতাংশ এবং মুসলিম জনগোষ্ঠী ছিল ৭০.৮ শতাংশ। সে প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম স্কুলে মুসলিম ছাত্র ছিল মাত্র ১৬.৪৭ শতাংশ। কুমিল্লাতে মুসলিম জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল ৬৬.৩ শতাংশ। তার বিপরীতে মুসলিম ছাত্র সংখ্যা ছিল মাত্র ১৩.২৩ শতাংশ। যশোরে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ৬০.৩ শতাংশের বিপরীতে মাত্র ৩.০৩ শতাংশ। পরিসংখ্যানে উনিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলার স্কুলগুলোতে হিন্দু-মুসলিম ছাত্রের অনুপাতে ব্যাপক ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়।

নিম্নে একটি চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

সারণি-০৩

উনিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলায় ইংরেজি স্কুলগুলোতে হিন্দু-মুসলিম ছাত্রের শতকরা হিসাব

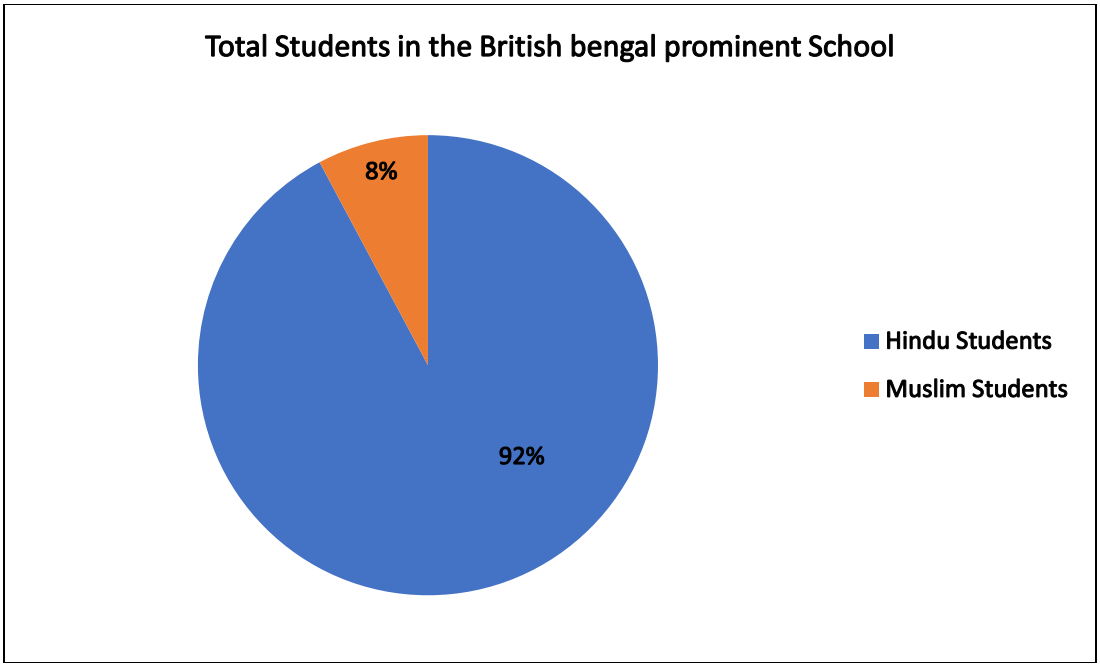

উপরের সারণি থেকে দেখা যায় বাংলার স্কুলগুলোতে শতকরা ৯২ শতাংশ হিন্দু ছাত্র ছিল অপরপক্ষে শতকরা মাত্র ৮ শতাংশ ছাত্র মুসলিম ছিল। অর্থাৎ বাংলার স্কুলগুলোতে প্রায় একচেটিয়া হিন্দু ছাত্র পড়াশোনা করতো। সে প্রেক্ষিতে অনুমান করা যায় যে, সমকালীন মুসলমানরা আধুনিক শিক্ষায় অনাগ্রহী ছিল। অবস্থাসম্পন্ন অধিকাংশ মুসলমানরা ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে রাজনৈতিক বা ধর্মীয় কারণে ইংরেজ প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষা থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখে। অল্প সংখ্যক মুসলমান স্কুল শিক্ষার সাথে পরিচিত ছিল।

বাংলার অধিকাংশ জনগণই স্বশিক্ষায় শিক্ষিত ছিল। অবস্থাসম্পন্ন মুসলমানরা ব্যক্তি পর্যায়ে গড়ে উঠা মাদরাসাগুলোতে পড়ালেখা করাতে স্বচ্ছন্দবোধ করতো। খুব সম্ভব মুসলমান ছাত্ররা স্কুলে নানা রকম হয়রানি ও বৈষম্যের স্বীকার হতো। বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত থেকে জানা যায় যে, বাংলার অধিকাংশ স্কুলের শিক্ষকরা ইউরোপীয়ান অথবা হিন্দু ছিল। তারা হিন্দু ছাত্রদের দিকে বেশী মনোযোগী ছিল। অপর একটি সূত্র থেকে ১৮৪১ থেকে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে হিন্দু-মুসলিম ছাত্র সংখ্যা নিম্নরুপ জানা যায় (রহিম, ১৯৯৪, পৃ.১১২-১১৩)।

সারণি-০৪

১৮৪১ থেকে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় হিন্দু-মুসলিম ছাত্র সংখ্যার পরিসংখ্যান

খ্রিস্টাব্দ	হিন্দু ছাত্র	মুসলমান ছাত্র	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	মোট ছাত্র
১৮৪১	৩১৮৮	(কলকাতা ও হুগলী মাদরাসা-৭৫১	বাংলার স্কুল কলেজ	৪০৩৪জন
১৮৪৬	৩৮৪৬	৬০৬	ক.মা.[১]-২২৪,হু.মা.[২]-২২২	৪৫৩৭জন
১৮৪৬	২৬৩	১৮	ঢাকা কলেজ	২৮১জন
১৮৫০-৫১	৩৮১৪	৭৯৬	ক.মা.-৪৩৩, হু.মা.-১৪৫	৪৬৭৪জন
১৮৫৫-৫৬	৬২০৫	৭৩১	ক.মা.-১৮৫, হু.মা.-১৭৫	৭২১৬জন
১৮৫৫-৫৬	৭৩১	২৪	ঢাকা স্কুল এন্ড কলেজ	৭৫৫জন
১৮৬৪	৪১জন বি.এ, ৯জন এম.এ, ১৭জন এল এল বি এবং কয়েকজন মেডিক্যাল ডিগ্রী লাভ করে।	১জন বি.এ এবং এমএ, এলএলবি ও মেডিক্যাল ডিগ্রী নাই।	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	৬৮জন
১৮৬৭	৮৮জন বিএ+এমএ	৫৭জন		৮৮জন
১৮৬৮-৬৯	৩১৫৫জন কলা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা	৫জন এমএ, ৩০জন বিএ, অন্যান্য-২২		৩২৬৯জন

উৎস: এম.এ.রহিম (১৯৯৪), *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭)*, ঢাকা: আহমেদ পাবলিশিং হাউস।

মুসলমানরা ক্ষমতা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর খুব দ্রুত সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অবস্থার অবনতির সম্মুখিন হয়। সামাজিক মূল শিক্ষা কার্যক্রম থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচারে তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়। ইংরেজ প্রশাসনের চাতুরতায় মুসলমানরা ভূমিহীন হয়ে ক্রমে কৃষক, তাতিঁ সম্প্রদায়ে পরিণত হয়ে পড়ে। আর্থিক দুর্দশার প্রভাবে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে ব্যাপক অধ:পতন হয়।

যথাযথ শিক্ষার অনুপস্থিতিতে সমাজের বিভিন্ন স্তরে মুসলমানদের উপর নানা রকম কুসংস্কার ভর করে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে হিন্দুরা ইস্ট ইণ্ডিয়া সরকারের আনুকূল্য লাভ করায় হিন্দুরা শিক্ষাক্ষেত্রে একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করে। মুসলমানরা আধুনিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। মুসলমানরা মাদরাসায় যে শিক্ষা লাভ করত তা দিয়ে সরকারি চাকুরি পাওয়ার সুযোগ ছিল না। প্রশাসনের প্রধান পদগুলোতে ইউরোপীয়ানরা আর অপেক্ষাকৃত ছোট পদগুলো একচেটিয়া হিন্দুরা অধিষ্ঠিত হতো।

[১] ক.মা. দ্বারা কলকাতা মাদরাসা বোঝানো হয়েছে।

[২] হু.মা. দ্বারা হুগলী মাদরাসা বোঝানো হয়েছে।

শিক্ষা প্রশাসনের পদগুলোতে একচেটিয়া হিন্দুদের আধিপত্য দেখা যায়। ফলে শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণে শিক্ষা প্রশাসনে মুসলমানরা প্রবেশ করতে পারে না। যার ফলশ্রুতিতে ইংরেজি স্কুলগুলোতে মুসলমান ছাত্ররা হতাশ হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের তালিকা উক্ত বক্তব্যের পক্ষে যুক্তিযুক্ত সমর্থন পাওয়া যায়। উনিশ শতকের মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত পাবনা ও কুষ্টিয়া জেলার দু,টি স্কুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের তালিকা থেকে দেখা যায় যে, স্কুল দুটিতে দীর্ঘদিন ধরে মুসলমান প্রধান শিক্ষকের নাম তালিকায় পাওয়া যায় না। দু,টি স্কুলেই দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু শিক্ষক প্রধানশিক্ষক হিসেবে দায়িত্বপালন করছে। যদিও এ অঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাধিক্য জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। এ বিষয়ে নিম্নোক্ত সারণি পর্যালোচনা করা যেতে পারে-

সারণি-০৫

পাবনা জেলা স্কুলে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকবৃন্দ, ১৮৫৩-১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।[3]

ক্র.নং	শিক্ষকের নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	কার্যকাল
০১	গৌরি নারায়ণ রায়	বি.এ (সিনিয়র স্কলার	১৮৫৩-৬৩
০২	ব্রজ মোহন রায়	,,	১৮৬৩-৭৩
০৩	চন্দ্রনাথ মৈত্র	,,	১৮৭৩-৭৬
০৪	ঈশ্বরদী চন্দ্রবোস	,,	১৮৭৬-৭৮
০৫	গোবিন্দ্র চন্দ্র মৈত্র	বি.এ (জুনিয়র স্কলার)	১৮৭৮-৮১
০৬	শশীভূষণ সেন	,,	১৮৮১-৮৪
০৭	রাজ কুমার রায়	জুনিয়র স্কলার	১৮৮৪-৮৬
০৮	সুরা নাথ চ্যাটার্জী	বি.এ	১৮৮৬-৯২
০৯	জগ বন্ধু ভর্দ্রা	বি.এ (প্লাকড)	১৮৯২-৯৬
১০	জগৎচন্দ্র সরকার	বি.এ	১৮৯৬-৯৮
১১	প্রসন্ন কুমার ঘোষ	বি.এ (প্লাকড)	১৮৯৮-১৯০০
১২	গোপাল চন্দ্র সরকার	বি.এ	১৯০০-১৯০৮
১৩	কোমল কৃষ্ণ সেন	এফ.এ	১৯০৮-১৩
১৪	চন্দ্র কান্ত ঘোষ	এম.এ	১৯১৩-১৪
১৫	ভুবন মোহন চৌধুরী	বি.এ	১৯১৪-১৮
১৬	কুমদ চন্দ্র সরকার	এম.এ, বি.টি	১৯১৮-২১
১৭	ভুবন মোহন চৌধুরী	বি.এ	১৯২১-২৬
১৮	মধুরা কান্ত নন্দী	এম.এ,বি.টি	১৯২৬-৩২
১৯	ধীরেন্দ্র নাথ চৌধুরী	বি.এ,বি.টি	১৯৩২-৩৩
২০	সদর উদ্দিন আহমেদ	বি.এ	১৯৩৩-৩৭

[3] উৎস: পাবনা জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের অফিসে স্থাপিত অনার বোর্ড থেকে সংগৃহীত।

পাবনা জেলায় ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারি অনুযায়ী হিন্দু জনগোষ্ঠী মাত্র ২৭.৫ শতাংশ পাওয়া যায়। অপরপক্ষে মুসলিম জনগোষ্ঠী ৭২.৪ শতাংশ পাওয়া যায়। কিন্তু পাবনা জেলা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ৮০বছর পর অর্থাৎ ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম একজন মুসলিম প্রধান শিক্ষকের পদে নিয়োগ লাভ করে। ৭২.৪ শতাংশ মুসলিম জনগোষ্ঠীর বসবাসের অঞ্চলে স্কুল প্রশাসনের প্রধান হতে মুসলমানদের ৮০ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। এর থেকে সহজেই অনুমিত হয় বাংলার যে সকল অঞ্চলে মুসলমানরা সংখ্যা লঘিষ্ঠ সে সকল অঞ্চলে মুসলমান যুবকদের অবস্থা অতি রুগ্ন ও ভয়াবহ।

সারণি-০৬

এম,এন, পাইলট হাইস্কুলে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকবৃন্দের তালিকা, কুমারখালী,কুষ্টিয়া।[৪]

ক্র.নং	নাম	কার্যকাল	
		হইতে	পর্যন্ত
০১	বাবু কৃষ্ণধন মজুমদার	১৮৫৬	১৮৭৮
০২	বাবু নলিনীকান্ত সেন	১৮৭৯	১৮৯১
০৩	বাবু ননী গোপাল মুখার্জী	১৮৯২	১৯১৬
০৪	বাবু হেমাণজলাল গোস্বামী	১৯১৭	১৯৪০
০৫	বাবু প্রফুল্ল চন্দ্র সেন	১৯৪১	১৯৪৮
০৬	জনাব মো.হাজারী শেখ	১৯৪৯	১৯৫১
০৭	বাবু প্রফুল্ল চন্দ্র সেন	১৯৫২	১৯৫৩
০৮	বাবু সুবোধ কুমার চক্রবর্তী	জুলাই, ১৯৫৩	সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩
০৯	বাবু ননী গোপাল রায়	অক্টোবর, ১৯৫৩	নভেম্বর, ১৯৫৩
১০	জনাব মো.আজহারুল ইসলাম	ডিসেম্বর, ১৯৫৩	এপ্রিল, ১৯৫৫

পদ্মার প্রধান শাখা গড়াই নদীর উপকূলে কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালীতে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে এম,এন পাইলট হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কুলটির অনারবোর্ডে প্রধান শিক্ষকের তালিকা লেখা রয়েছে। উক্ত অনারবোর্ডের তালিকানুযায়ী স্কুলটির প্রতিষ্ঠাকালীন প্রধান শিক্ষকের নাম বাবু কৃষ্ণধন মজুমদার।

[৪] উৎস: কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার এম,এন, পাইলট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের অফিসে স্থাপিত অনার বোর্ড থেকে সংগৃহীত।

আলোকচিত্রঃ কুমারখালী এম এন পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কুমারখালী, কুষ্টিয়া, উৎসঃ সংগৃহীত।

১৮৫৬ হতে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোন মুসলিম প্রধান শিক্ষকের নাম নেই। অর্থাৎ ৯৩ বছর পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে হিন্দু শিক্ষকরা প্রধান শিক্ষকের পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে একজন মুসলিম শিক্ষক মাত্র ৩বছরের জন্য প্রধান শিক্ষকের পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হলেও পরবর্তীতে আবার হিন্দু শিক্ষককে প্রধান শিক্ষকের পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রায় ১০০ বছর এ প্রতিষ্ঠানটি হিন্দু প্রাধান শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। কিন্তু ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে নদীয়া জেলার জনসংখ্যাতে দেখা যায় ৫৫.৭ শতাংশ মুসলিম জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। নদীয়া জেলার পূর্ব বঙ্গের অংশে অর্থাৎ বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলাতে মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা আরো বেশী ছিল। এভাবে দীর্ঘ সময় ধরে মুসলমানরা বৈষম্যের শিকার হয়। এ বৈষম্য দূর করার জন্য মুসলমানরা সচেতন হয়ে সংঘবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সরকারের শাসনকালে উনিশ শতকের প্রারম্ভে মুসলমান সম্প্রদায় তাদের বৈষম্যের বিষয়ে সচেতন হতে শুরু করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রোধ পর্যায়ক্রমে মুসলিম সম্প্রদায়কে পূনর্জাগরণের পথে ধাবিত করে। বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁরা সংগঠিত হয়ে কোম্পানী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পথ প্রশস্ত করে তোলে। ক্রমান্বয়ে সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষ জাতীয়তাবোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন জোরদার করে এবং অবশেষে তাঁরা সফল হয়। এভাবে বৃটিশ বাংলায় নানা পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে সামাজিক সাংস্কৃতিক নানাবিধ মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গ্রহণ বর্জনের মাধ্যমে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সূচিত হয়।

উপসংহারঃ

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা হয়। মুসলিম শাসকদের সূচনাপর্বে প্রাচ্য ও মধ্য এশিয়া হতে আগত বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী মুসলিম বিজেতাদের সংগে বাংলায় আগমন করেন এবং এদের অধিকাংশ আর নিজ দেশে ফিরে যান নি। ইসলাম ধর্ম প্রচার এবং শাসন ক্ষমতার প্রতিযোগিতার প্রয়োজনে তাদের অধিকাংশ এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস

করতে থাকেন। স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিজেতাদের উন্নত শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। যার ফলশ্রুতিতে স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে তাদের সংস্কৃতির ব্যাপক সংমিশ্রণের মাধ্যমে নতুন ধরণের অপেক্ষাকৃত উন্নত সংস্কৃতির উদ্ভব হয়। এ ব্যবস্থা দীর্ঘকাল ব্যাপী গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক কাঠামো অষ্টদশ শতক পযন্ত স্থিতিশীল ছিল।

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পলাশি যুদ্ধোত্তর সময়ে ইংরেজ বেণীয়ারা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এদেশের শাসনক্ষমতা দখল করে। ইংরেজ বেণীয়ারা এদেশের অর্থ-সম্পদ ব্যাপকভাবে লুণ্ঠন করে স্বদেশে নিয়ে যায়। অতিরিক্ত অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠনের ফলে এদেশের মানুষকে দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হতে হয়। ইংরেজ বেণীয়ারা এদেশের সামজিক কাঠামোকে ধবংশ করে নতুন জমিদারি কাঠামো তৈরির মাধ্যমে এদেশের মানুষকে দুইভাগে বিভক্ত করে। শাসন ক্ষমতার প্রতিযোগিতা ও ধর্মীয় কারণে মুসলমান সম্প্রদায় দিনে দিনে প্রন্তিক পযায়ে চলে যায়। সুচতুর ইংরেজ বেণীয়ারা এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শাসন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রনের জন্য স্থানীয় সমাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নতুন প্রশাসনিক কাঠামো সৃষ্টি করে এবং নতুন নতুন আইন কানুন তৈরি করে। ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে মুসলিম সম্প্রদায় ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বারংবার আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করে। ফলশ্রুতিতে ইংরেজ সরকারের সাথে তাঁদের ক্রমশ দুরত্ব তৈরি হতে থাকে এবং দীর্ঘদিন আন্দোলন সংগ্রামের সাথে জড়িত থাকার ফলে শিক্ষা ও অর্থনীতিতে ক্ষয়িষ্ণু রুপ ধারণ করে।

সময়ের পরিক্রমায় ইউরোপে রেঁনেসা আন্দোলন শুরু হয়। ইউরোপের রেঁনেসার প্রভাব বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সরকারের কর্মকর্তাদের কার্যক্রমে প্রকাশ পায়। বৃটিশ কর্মকর্তাদের মনের অজান্তে `বৃটিশদের শাসন ভাল, প্রমান করতে গিয়ে অথবা তাদের শাসন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে তারা এদেশের শিল্প-সংস্কৃতিতে উজ্জ্বল অবদান রাখতে শুরু করেন। আঠারো শতকের শেষার্ধে ইউরোপীয়রা এদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে মুদ্রিত সংবাদপত্র প্রকাশ করে। এ সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশে সংবাদপত্রের প্রচার ও প্রচলন খুব একটা না থাকলেও নাতিদীর্ঘ সময়ে বিভিন্ন সংবাদপত্র মুদ্রিত হতে থাকে। মুদ্রিত সংবাদপত্রগুলো অচিন্তনীয় জনপ্রিয়তা লাভ করে। শুরুতে এসব পত্রিকাগুলো ইউরোপীয় ব্যক্তিবর্গের সম্পাদনায় পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে এদেশীয় ব্যক্তিবর্গের সম্পাদনায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। কিন্তু তৎকালীন সময়ে প্রকাশিত সকল পত্রিকা ইংরেজ সরকারের আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়। এ সব পত্র-পত্রিকায় ইংরেজ শাসনের বিভিন্ন সংবাদ প্রকাশিত হয়।

এ সময়ে বাংলায় ইউরোপীয় শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির একচেটিয়া প্রভাব তৈরি হয়। দীর্ঘদিন ধরে ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে মুসলিম সম্প্রদায় ইউরোপীয় শিল্প-সংস্কৃতি থেকে দূরে থাকলেও হিন্দু সম্প্রদায় তা সহজে গ্রহণ করে বা ইউরোপীয় নীতি ও সংস্কৃতিতে দ্রুত অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। শিক্ষা, শিল্প-সাহিত্য, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন সামাজিক সূচকে হিন্দু সম্প্রদায় ইংরেজ আনুকূল্যে একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে বোধোদয় তৈরি হয়। মুসলিম সম্প্রদায়ের বোধোদয়ের কারণে ইংরেজরাও মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি কিছুটা উদার মনোভাব তৈরি করে।

এ সময় বাংলার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে নবজাগরণের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদাযের মধ্যে ধর্মীয় গোড়ামী পরিহার করে বাস্তবতার আলোকে আধুনিক সংস্কৃতির সাথে মোটামুটি আকারে গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে নব জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত হয়। তাঁরা ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ইংরেজ আনুকূল্য লাভের চেষ্টা করে। মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি শ্রেণী আধুনিক ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্রুত পরিবর্তনের চেষ্টা করে। তথাপিও সময়ে সময়ে মুসলিম সম্প্রদায় ইংরেজ সরকারের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা অব্যাহত রাখে। পক্ষান্তরে হিন্দু যুবকরা শাসকগোষ্ঠীর স্তুতি করায় সরকারের আনুকূল্য লাভ করে এবং তারা শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতিসহ সর্বক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার লাভ করে। বস্তুত, বৃটিশ সরকারের চাতুরতায় সমাজে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক বিনষ্ট হয়।

এরুপ অবস্থা সত্তেও সচেতন মুসলিম সম্প্রদায় শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাঁরা ধর্মীয় গোড়ামী পরিহার করে বাস্তবতার নিরীখে আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে মানিয়ে নিয়ে নিজেদের পরিবর্তন করে একটা বিশেষ আধুনিক সম্প্রদায় গড়ে উঠে এবং পরিশেষে তাঁরা নেতৃত্বের আসনে ভূমিকা পালন করে।

গ্রন্থপঞ্জিঃ

০১. H.Blochman(1968), *Contribution to the Geography and History of Bengal*, Calcutta: Asiatic Society of Bengal.

০২. আলী, এ কে এম ইয়াকুব (২০০৮), *মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প*, ঢাকা: বুক চয়েস।

০৩. Dani, Ahmed Hossain (1961), *Muslim Architecture in Bengal*, Dacca: Asiatic Society of Pakistan.

০৪. Raverty, H.G. (1970), *Minhaj-al-din Siraj, Tabaquat-i-Nasiri*, Vol.1, London: Gilbert and Rivington.

০৫. রহিম, এম.এ.(১৯৯৪), *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, (১৭৫৭-১৯৪৭),* ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউজ।

০৬. Dani, A.H.(1958), *"Shamsudding Ilyas Shah Shah-i-Bangala*", Sir Jadunath Sarkar Commemoration Volume, Punjab: Punjab University.

০৭. Smith,Vincent Arther(1970), *The oxford History of India*, London: Pereival spear.

০৮. Khan, Nurul Islam (ed.) (1978), *Bangladesh Districts Gazetters; Pabna*, Dacca: Governmet press.

০৯. দেবী, মহাশ্বেতা (১৩৬১ব.), *তিতু মীর*, কলিকাতা: সমকাল প্রকাশনী।

১০. Ali, Quazi Azhar (1978), *District Administration in Bangladesh*, Dhaka: National Institute of Public Administration.

১১. Halhed, Nathaniel Brassey (1980), *A Gramar of the Bengal Language*, Calcutta: Anands Publishers pvt. ltd.

১২. Bahadur, R.M.C.(1918), *A summary of the changes in Jurisdiction of the Districts in Bengal (1757-1916)*, Calcutta: Bengal Secretariat press.

১৩. ইসলাম, সিরাজুল(১৯৮৪), *বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো,* ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

১৪. *Minute of lord cornwallis,* 11 February 1793, in the second report(1810), Perliamentrary select committee, App; 9A.

১৫. sherwani, Haroon khan (1981), *Muslim Political Thought and Administration,* New Delhi: Munshiram Manoharlal publishers pvt. Ltd.

১৬. Losty, J.P.(1996), *Early Views of Gaur and Pandua by the Indian Attist Sita Ram*, Vol.1, Dhaka: ICSBA.

১৭. *Regulation 7,1831, and act 111 of 1835*.

১৮. Field, Chsrls Dickenson (ed)(2020), *introduction to the regulation of the Bengal code,* delhi: Pranava Books.

১৯. Adam,William & babu, Anathnath (ed) (1941), *Report on the State of Education in Bengal*,1835-1838, Calcutta: Calcutta University.

২০. মওদুদ, আবদুল (১৯৮২), *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশঃ সংস্কৃতির রুপান্তর,* ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

২১. Huq, Enamul (1968), *Nawab Bahadur Abdul Latif; His writings and related documents*, Dhaka: Samudra Prokashani.

২২. *The India Gazette*, 22.11.1831 and *The Calcutta Monthly Journal*, November, 1831.

২৩. রায়, অতুল চন্দ্র ও চট্টোপাধ্যায়, প্রণব কুমার (২০১৩), *ভারতের ইতিহাস প্রাচীন যুগ থেকে ১৯৫৫খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত,* কোলকাতাঃ ইউনিক ইন্ডিয়া প্রিন্টোগ্রাফ।

২৪. chakrabarti, Raj manohan (1918), *Summary of changes in the Jurisdiction of Districts in Bengal, (1757-1916),* Calcutta: Bengal secretariat press.